‘অপারেশন ক্লিন হার্ট’ : জবাবদিহি প্রয়োজন

মাহমুদুর রহমান মান্না

ঢাকাতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের নামানোর খবর পেলাম ১৬ তারিখেই বগুড়ায়। জেলা আওয়ামী লীগের নেতা তোতা সকালে ফোন করে জানাল খবরটা। বলল, দেখুন তো ঢাকায় চেক করে।

আগের দিন আমরা রাজশাহীতে ছিলাম আওয়ামী লীগের বিভাগীয় কর্মী সম্মেলনে। পরদিন বগুড়ার শেরপুরের সীমাবাড়িতে শেখ হাসিনার জনসভা কৃষক নেতা আজম হত্যার প্রতিবাদে। সেই জনসভায়ও যাওয়ার ইচ্ছা। তাই আগের দিনই আমরা অর্থাৎ আমি, ড. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ব্রুনেইয়ের সাবেক রাষ্ট্রদূত মমতাজ হোসেন ও আ খ ম জাহঙ্গীর হোসেন বগুড়া চলে এসেছিলাম। সকালে শহর থেকেই আমাদের শেরপুর যাওয়ার কথা। এবং সেই সকালেই তোতা খবরটা দিল।

আমি ঢাকায় দুই-তিন জায়গায় ফোন করলাম। মজার ব্যাপার, কেউই বলতে পারলেন না সেনাবাহিনী নামার খবর। অবশেষে একজনকে বললাম, ভাই রাস্তায় গিয়ে একটু দেখে আসুন না ব্যাপারটি কী। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে জানালেন, হ্যাঁ ঘটনা সত্যি।

একটা ব্যাপার বাংলাদেশ হওয়ার পর এভাবে ঘটে গেছে। পাকিস্তান আমলে আর্মি নামালে সেটা একটা বিরাট খবর ছিল। আর বাংলাদেশে? এই ৩১ বছরের বেশির ভাগ সময় তো আর্মিই আমাদের শাসন করেছে। গণতন্ত্র যেটুকু সময় পেয়েছে তাও তো মেলা সংগ্রামের পর। পাকিস্তান আমল থেকেই এ রকম একটা ধারণা কেমন করে যেন গড়ে উঠেছিল যে, দেশে যখনই কোনো সংকট দেখা দেয় তখন আর্মি নামে। আর্মি যেন দেশের রক্ষাকর্তা আর সবাই ধ্বংসকারী। ধারণাটা এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে অনেকটা চলে গেলেও তার শেকড় রয়ে গিয়েছিল।

এরশাদ চলে যাওয়ার পর কয়েকটা বছর গণতন্ত্রের যে চর্চা হয়েছে তাতে মানুষের মনে রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও নেতা সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক ধারণাও আর গড়ে ওঠেনি। ধীরে ধীরে অতঃপর রাজনীতি থেকে নীতি খসে গেছে। তার জায়গা দখল করেছে সীমাহীন নীতিহীনতা, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা, ব্যক্তিবন্দনা ও দলবাজি, অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার নির্লজ্জ, নগ্ন মদমত্ততা। পরিস্থিতি এমনভাবে নেমে গেছে, আগেও ঘুষ-দুর্নীতি ছিল এখন তার জায়গা দখল করে নিয়েছে জবরদস্তি, লুটপাট, মাস্তানি এবং সবচেয়ে উদ্বেগ ও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, যাদের দায়িত্ব এগুলো উৎপাটন করা তারা নিজেরাই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। কেবল তাই নয়, এগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে এখন ধীরে ধীরে আন্ডারওয়ার্ল্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন এখনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সময় আসছে যখন সিটি করপোরেশন নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে সংসদ নির্বাচনেও। তখন সরকারের চেহারা কী হবে তা ভাবতেই কষ্ট হয়। এখনই তো অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে, সাংসদদের অনেকেই সন্ত্রাসী, মন্ত্রীরা কেউ কেউ সন্ত্রাসীদের গডফাদার।

বেগম জিয়া যে অবশেষে সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনী ডেকেছেন সে তো উপায়হীন হয়েই। ব্যর্থতার গ্লানি কাঁধে নিয়েই। মাত্র কদিন আগে তার সরকারের বর্ষপূর্তিতে তিনি এ রকম ভাষণ দিলেন কেন যেখানে তিনি আরো এক বছর সময় চাইলেন। তখনো কি তিনি জানতেন না যে, আর মাত্র ছয় দিনের ব্যবধানে তাকে সেনাবাহিনী নামাতে হবে? ব্যাপারটা একটা বিরাট প্রশ্নের জন্ম দেয়। মজার ব্যাপার সেনারবাহিনী নামানোকে বিরোধী দল এত বেশি বিরোধিতা করেনি, যতখানি করেছে সরকারি দলের লোকজন। পত্রপত্রিকায় প্রতিনিয়ত এ রকমই প্রতিবেদন

দেখতে পাচ্ছি। মন্ত্রিসভার বৈঠকে নাকি এ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি তা নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, এক বছর আপনাদের সময় দিয়েছি, আপনারা কিছু করেননি কেন?

আমাদের রিপোর্টাররা ইনসাইড রিপোর্টিং কতখানি সঠিকভাবে করতে পারেন তা অবশ্য দেখার বিষয়। কিন্তু প্রায় সব পত্রিকায় এ খবরটি এভাবে এসেছে এবং তাতে আমি খানিকটা বিস্মিত হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এক বছর সময় কাকে দিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই অর্থমন্ত্রী বা যোগাযোগ মন্ত্রীকে নয়! সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব তো হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের। তাদের ব্যর্থতায় পুরো সরকার দায়ী হচ্ছে কেন? আর প্রধানমন্ত্রী এক বছর সময় দিলেন কবে? উনি তো চেয়ে নিলেন আরো এক বছর। উনি নিশ্চয়ই তার সরকারের এক বছরের কথা বলেছেন। বর্ষপূর্তির ভাষণে সেই এক বছরকে তো তিনি প্রশংসা করেছেন।

আর্মি নামানোর ব্যাপারটা তো দেখা যাচ্ছে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী আর কাউকে বিশ্বাসও করেননি। এমনকি তার ক্যাবিনেটকেও নয়। পত্রিকার খবরে প্রকাশ, সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গেই কেবল তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সত্যি কি তাই? আমি সমালোচনা করছি না। সরকার প্রধানকে তো মাঝে মাঝে এ রকম সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যদিও এটা প্রমাণ করে যে, এ ক্ষেত্রে তিনি একবারে একা। কিন্তু ব্যাপারটা যদি এতই গোপনভাবে করা হতো তবে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কেউ ধরা পড়ল না কেন? সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় অনেকেই নাকি এ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, খবর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং খবর পেয়েই সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দিয়েছে। এজন্যই আর্মি অ্যাকশনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কীভাবে এ খবর ফাঁস হয়ে গেল? এ যে 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।'

এ প্রশ্নটা করা যায় এ কারণে যে, সেনাবাহিনী গত কয়েক দিনের অপারেশনে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীরা তেমন ধরা তো পড়েনি, ধরা পড়েছেন কমিশনার আর রাজনৈতিক নেতারা। সাবের হোসেন চৌধুরী এবং শেখ সেলিমের গ্রেপ্তারের কথাই ধরি। এ গ্রেপ্তার কি সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্যে? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কী বলছেন এ ব্যাপারে? হাসান মাহমুদ বলেন, সাবেক উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরীর কাছে আপত্তিকর এমন সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে, যা একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে অস্থিতিশীল ও জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য প্রণীত হয়েছে এবং যা রাষ্ট্রবিরোধী। তার অফিস থেকে এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রবিরোধী প্রচুর পরিমাণ দলিলপত্র আটক করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী এসব কার্যকলাপের অভিযোগে গত রোববার মধ্য রাতে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপিকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বছর তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাদারীপুর সফরে যাওয়ার সময় শেখ সেলিমের নেতৃত্বে ফেরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে সেই সফরে পরিকল্পিতভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং তার মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে হত্যা করার প্রয়াস চালানো হয়। এর ফলে বেগম খালেদা জিয়ার সফর বাধাগ্রস্ত হয় এবং তিনি তার মাদারীপুর সফর বাতিল করতে বাধ্য হন। সিআইডি এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার তদন্ত করছে।

একজন সাংসদকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা যায় কি না এ প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা। যে অভিযোগে এ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটা তো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তাই এদের গ্রেপ্তারের কাজ তো হওয়া উচিত পুলিশের। সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হলো কেন? এতে কি সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত হয়ে পড়বে না?

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে এবং সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে যা শুনেছি তা ভাবিত করছে অনেককেই। এ কথা অতি সম্প্রতি বারবার বলা হচ্ছে যে, সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন নিরীহ মানুষ হয়রানির শিকার না হয়। অথচ সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেনই। আটজন আটকাবস্থায় মারা গেছেন। শেখ সেলিমকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর আমানউল্লাহ আমানকে? উনি তো একজন মন্ত্রী। তার পতাকাবাহী গাড়ি কোনো বাহিনী সার্চ করে কীভাবে? মন্ত্রী আমানও কি সন্দেহ তালিকার মধ্যে? তাহলে তিনি মন্ত্রী আছেন কীভাবে? একজন মন্ত্রী যদি সরকারেরই সন্দেহের তালিকায় থাকেন তবে সরকারের ভিত্তি থাকে কী?

লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (এআই) বাংলাদেশের সেনা হেফাজতে কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে সেনা ও পুলিশের নির্যাতনে এসব লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তার আশু তদন্ত, মৃত্যুগুলোর জন্য যেসব সেনা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে দায়ী বলে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং বেসামরিক লোকদের গ্রেপ্তারের সেনাবাহিনী জড়িত হওয়ার আইনগত ভিত্তি ব্যাখ্যা করার দাবি করেছে ওই সংস্থা।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'অ্যাকাউন্টিবিলিটি নিডেড ইন অপারেশন ক্লিন হার্ট' নামের বিবৃতিতে এআই বলেছে, তারা জেনেছে সেনাবাহিনীর হাতে আটক থাকা অবস্থায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া প্রহারে আহত ১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন অভিযোগ করেছেন, তারা সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতনে মারা গেছেন। এ কারণেই বাংলাদেশ সরকারের উচিত এসব অভিযোগ তদন্ত এবং তদন্তে ওইসব মৃত্যুর জন্য যাদের দায়ী করা হবে, তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করা। এতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, নিহতদের সবাই হৃদরোগে মারা গেছেন। কিন্তু নিহতদের আত্মীয়স্বজনরা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকার সময় নির্যাতন করে এদের হত্যা করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, খবর পাওয়া গেছে মৃতদেহ তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। এ কারণে সরকারি ময়নাতদন্তের ফলাফল নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আরো বলেছে, আটককৃতদের কেউ কেউ বিবেকের বন্দি। সাবের হোসেন চৌধুরী এবং শেখ ফজলুল করিম সেলিমের আটক সম্পর্কে অ্যামনেস্টি ধারণা করছে যে, শুধু শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের বিরোধিতা করার কারণেই তাদের আটক করা হয়েছে।

আসলে বেশকিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে সেনাবাহিনী কতদিন থাকবে? সরকারি দলের অধিকাংশ মন্ত্রী নেতারাই চাইছেন আর্মি তাড়াতাড়ি চলে যাক। আবার সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য পত্রিকায় আসছে, কাজ শেষ করতে হবে তাদের। ব্যর্থতার কোনো সুযোগ নেই। সুন্দর কথা। কিন্তু সন্ত্রাস ও অপরাধ পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারবে তারা? তাই কি সম্ভব? অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানই বলেছেন, এ সাফল্য কতদিন ধরে রাখতে পারবে তারা? আপাতত যে স্বস্তির ভাবটা এসেছে মানুষের মধ্যে তাই যদি ধরে রাখতে পারে তারা তাও একটা সাফল্য বটে।

আজ যে ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও অপরাধ পুরো সমাজকে গিলে খেতে উদ্যত হয়েছে তার জন্য দায়ী কিন্তু এই রাজনীতিক ও সমাজ ব্যবস্থা। আমরা দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এই সন্ত্রাসকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছি, অপরাধের দিকে চোখ বন্ধ করে থেকেছি। বেগম জিয়ার সময়ে এসে তা সহ্যসীমার বাইরে চলে গেছে। এজন্যই আমি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে একমত যে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ অপারেশনের বিকল্প ছিল না। কিন্তু এ কথা সবারই মনে রাখা উচিত, আর্মি অপারেশন দিয়ে সমাজ, রাজনীতির, অপরাধ-দুর্নীতির মূলোৎপাটন সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রীকে গভীরভাবে ভাবতে হবে কথাটা। এ অভিযানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। যারাই এ কাজ করবে তাদের অবশ্যই আইন ও মানবাধিকারের মানদণ্ড মানতে হবে। বেগম খালেদা

জিয়ার জন্য নিঃসন্দেহে এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এতে যদি তিনি ব্যর্থ হন সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

মাহমুদুর রহমান মান্না : ডাকসুর সাবেক ভিপি। রাজনীতিবিদ।